*Copula:* Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXII, June 2015

# প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন: বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতির গুরুত্ব

**মোঃ আনিছুর রহমান***

[**সারসংক্ষেপ:** প্রকৃতির কার্যধারা ও মানবপ্রকৃতি আজও মানবীয় জ্ঞানের কাছে অনেকাংশে দুর্জ্ঞেয় ও জটিল। শারীরিক, জীবতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক কারণে প্রকৃতি ও মানুষের অভিযোজন ঘটে। বর্তমানে বিশেষতঃ সাংস্কৃতিক কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মনুষ্য কর্মকাণ্ডের ভার তথা প্রকৃতিতে পরিবর্তন বা পুনর্গঠন জনিত প্রয়াস ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানবজাতি পরিবেশগত ঝুঁকির কবলে পতিত। প্রকৃতি ও মানুষের মিথস্ক্রিয়ার নানা রূপ ও তার ফলাফল আমাদের অজ্ঞাত, বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রতিষ্ঠিত। অযাচিত ও অভূতপূর্ব ফলাফল আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত বা হতবিহ্বল করে দিতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। মহার্ঘ মানবঅস্তিত্বের স্বার্থে তথা নৈতিক কারণে আমাদের উচিৎ প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতি অবলম্বন করা। বর্তমান প্রবন্ধে প্রকৃতি ও মানুষের মিথস্ক্রিয়ার সমকালীন রূপ বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতি অবলম্বনের গুরুত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে।]

## ভূমিকা

সতর্কতা (precaution)-র আগে বিনম্রতা (humility)-র বিষয়টি আসে। সাধারণতঃ তারাই সতর্ক হয় যারা নিজেদের যোগ্যতা-সামর্থ্য সম্বন্ধে পরিমিত মূল্যায়ন করে। অহমিকা, অন্যায্য অজুহাত ও অতিরিক্ত আশাবাদের বদলে বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতি সহযোগে জীবন যাপন করা কল্যাণকর, বিজ্ঞতাপূর্ণ ও নৈতিক। প্রকৃতি, মানুষ ও সভ্যতার সম্পর্ক নিঃসন্দেহে নিবিড়। প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন সাধন অনিবার্য ও স্বাভাবিক। তবে এই পরিবর্তন অবশ্যই প্রকৃতির স্বাভাবিক কার্যধারা ও ভারসাম্য রক্ষা করেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃতির স্বরূপ ও মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের রয়েছে গভীর অজ্ঞানতা ও অস্পষ্টতা এবং নানা রূপ বৈজ্ঞানিক অনিশ্চয়তা। ফলে পরিবর্তনের অনিবার্য বাস্তবতা থেকে যেন প্রতিকারহীন ও বেদনাদায়ক ঘটনা না ঘটে সে

• Md. Anisur Rahman, Associate Professor, Department of Philosophy, Bangladesh Open University, Gazipur.

কারণে অনেক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতির গুরুত্ব উপলব্ধি ও এগুলোকে অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাকৃতিক পরিবেশে অযাচিত পরিবর্তন ও বিপর্যয় রোধ করার ক্ষেত্রে বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতি অবলম্বন করা কি কারণে নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সেটি প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। এলক্ষ্যে প্রকৃতি ও মানুষের মিথষ্ক্রিয়ার সমকালীন রূপ অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

## বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতি (Humility and Precaution Principles)

### বিনম্রতা নীতি:

বিনম্রতা হলো নম্র হওয়ার প্রবণতা বা গুণ, মিথ্যা গর্ব ও ঔদ্ধত্য হীনতা; অন্য কথায়, নিজের সক্ষমতা-যোগ্যতা সম্বন্ধে এক পরিমিত বা বিনীত মূল্যায়ন। আত্মপ্রেম, আত্মগর্ব ইত্যাকার প্রবণতার বিপরীতে বিনম্রতাকে বহু ধর্মে ও স্বাধীন নৈতিক চিন্তায় একটি সদগুণ (virtue) হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ নিচের কথাগুলি উল্লেখ করা যায়:

> Humility is variously seen as the act or posture of lowering oneself in relation to others, or conversely, having a clear perspective and respect for one's place in context. In a religious context this can mean a recognition of self in relation to a deity or deities, acceptance of one's defects, and submission to divine grace as a member of an organized, hierarchical religion. Absent a religious context humility can still take on a moral and/or ethical dimension.[১]

অর্থাৎ সদগুণসমূহ কর্মকান্ড নির্বাচন ও সম্পাদনের ক্ষেত্রে পথ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সদগুণ হিসেবে বিনম্রতার দাবি হলো, সহৃদয়তা নিয়ে এবং নিজেকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে কাজ করা। বিবেচ্য ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের প্রতি সমীহ, স্পষ্টভাবে পুরো পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা, এবং নিজের ক্ষুদ্রতা-ঘাটতি মনে রাখা বিনম্রতা তথা বিনম্রতা নীতি (the Humility Principle)-র লক্ষণ।

### সতর্কতা নীতি:

সতর্কতা হলো ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন সম্ভাব্য বিপজ্জনক, অসুখকর, অযাচিত বা ক্ষতিকর ঘটনা বা ফলাফল প্রতিরোধ বা পরিহার করার জন্য গৃহীত আগাম পদক্ষেপ (measure) বা কার্য (action)। অন্য কথায়, সতর্কতার অর্থ হলো মারাত্মক বিপর্যয় বা ক্ষতির সম্ভাব্য বিপদের মুখে বা বিপরীতে মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কার্য নির্ধারণ করা। সতর্কতা নীতি (the Precautionary Principle) হলো যেখানে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা উপলব্ধি অদ্যাবধি অসম্পূর্ণ সেখানকার সম্ভাব্য ঝুঁকি (risks) প্রশমন বা মোকাবিলার এক কৌশল। অন্য কথায়, ঝুঁকি নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে

বৈজ্ঞানিক অনিশ্চয়তা রয়েছে তা বুঝে অগ্রসর হওয়ার এক আত্মরক্ষামূলক কৌশল। অনিশ্চয়তার কারণে দেখে-শুনে-বুঝে পা ফেলার নীতি। ঝুঁকির বিপর্যয়-পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং বিপর্যয়-পূর্ববর্তী নিয়ন্ত্রণই সতর্কতা নীতির লক্ষ্য। UNESCO-র COMEST প্রতিবেদনে এ নীতির উন্মেষ সম্পর্কে বলা হয়:

> The emergence of increasingly unpredictable, uncertain, and unquantifiable but possibly catastrophic risks such as those associated with Genetically Modified Organisms, climate change etc., has confronted societies with the need to develop a third, anticipatory model to protect humans and the environment against uncertain risks of human action: the *Precautionary Principle* (PP). The emergence of the PP has marked a shift from *postdamage* control (civil liability as a curative tool) to the level of a *pre-damage* control (anticipatory measures) of risks.[২]

অর্থাৎ অনুজীবের জেনেটিক পরিবর্তন বা জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনাগুলোতে সমাজে ক্রমবর্ধমান হারে বড় ধরনের বিপর্যয়ের ঝুঁকি বেড়েই চলছে। বিজ্ঞান এ বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছে না। তাই বড় ধরনের বিপর্যয়-উত্তর ক্ষতিপূরণ বা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পূর্বেই সাবধানতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে এই নীতির উন্মেষ হয়।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিও শহরে জাতিসংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে যে রিও ঘোষণা গৃহীত হয় তার পনের নাম্বার মূলনীতিতে সতর্কতা নীতি পরিষ্কারভাবে পরিব্যক্ত হয়। যেখানে মারাত্মক বা অমোচনীয় ক্ষতির হুমকি রয়েছে সেখানে পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার অভাবের কথা বলে, অন্যকথায় কতিপয় কার্যকারণ সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ার যুক্তিতে পরিবেশ অবনয়ন প্রতিরোধের দায় এড়ানো যাবে না। অর্থাৎ এ ধরনের সম্ভাব্য মহাদুর্যোগের ক্ষেত্রে সতর্কতা নীতি অবলম্বন করার বিকল্প নেই। তবে রাষ্ট্রভেদে এর মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। 'রিও ঘোষণা'য় এ প্রসঙ্গে বলা হয়:

> In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.[৩]

এখানে বলা হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার অভাব যেমন সতর্কতা নীতি গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে যথার্থ কারণ নয়, তেমনি কম সামর্থ্য সতর্কতা নীতি এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথার্থ কারণ হতে পারে না; সামর্থ্য কম থাকলেও প্রত্যেক জাতি রাষ্ট্র তার সক্ষমতা অনুযায়ী সতর্কতা নীতি গ্রহণ ও কার্যকর করবে।

## প্রকৃতি, মানুষ ও সভ্যতা : আন্তঃসম্পর্ক (Nature, Man and Civilization : Interrelation)

যখন বলা হয় অথবা এভাবে মূল্যায়ন করা হয় যে, মানুষ হলো প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক বস্তু থেকে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন, তখন সাধারণতঃ মানুষের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয়; এ বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ বুদ্ধিবৃত্তি, সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতা। অর্থাৎ এ বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে মানুষকে এক্ষেত্রে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়।  আবার যখন বলা হয়, মানুষ হলো বৃহৎ প্রকৃতি সত্তারই অপরিহার্য একটি অংশ তখন মানবিক, প্রাণিক, জৈব ও অজৈব পৃথিবীর অবিচ্ছিন্নতা ও সমতার (biospherical egalitarianism) উপর জোর দেয়া হয় এবং প্রস্তাব করা হয় যে, প্রকৃতির অন্যান্য সত্তা মানুষের ন্যায় মূল্যবান তাই মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্ক মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতিমালা বা তত্ত্ব প্রযোজ্য হবে। রোনাল্ড হ্যাপবার্ণ বলেন, বস্তুতঃ মানুষকে যেমন তার পরিবেশ ও প্রকৃতি থেকে পুরোপুরি পৃথক করা যায় না, তেমনি তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির অঙ্গিভূত করা যায় না; এ উভয় বিবেচনাই হবে অতিরঞ্জন মাত্র[৪]- প্রথমটি হবে মনুষ্যকেন্দ্রিকতাবাদ এবং দ্বিতীয়টি হবে নিরেট প্রকৃতিবাদ। হ্যাপবার্ণ-এর এই ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত কিনা সে প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, এটি কোন অত্যুক্তি নয়। কারণ মানুষের দেহের সকল প্রকার উপাদান এবং যে সকল উপকরণ ও বস্তু মানুষ ব্যবহার করে তা-র সবই প্রকৃতি সরবরাহ করে। তাই গুণগতভাবে পৃথক হলেও মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক অন্য সকল প্রজাতির অনুরূপ বলে দাবি করা যায়। সংকট তৈরি হয় তখনই যখন মূল্যায়ন করতে গিয়ে মানুষকে আলাদাভাবে উচ্চ স্থানে বসিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে এর শোষক-শোষিতের সম্পর্ক গড়া হয়।

মার্কসীয় দর্শনে তত্ত্বগতভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, মানুষের ইতিহাস হলো প্রকৃতির ইতিহাসেরই অংশ। আরও বলা হয় যে, মানবজাতির বিকাশের একটা অর্থ হলো প্রকৃতিতে তার পুনর্গঠনজনিত ক্রিয়াকলাপের নিরন্তর ক্রমবিকাশ। সংস্কৃতি বা সভ্যতার উন্মেষ ও রূপায়নে প্রাকৃতিক পরিবেশ মোকাবেলাজনিত প্রচেষ্টা এবং তার সাথে মনুষ্যজীবের অভিযোজনের নিমিত্ত দলগত কর্মকান্ডের ভূমিকা রয়েছে। হেড্গার (Hedger) এ প্রসঙ্গে বলেন,

> মানুষের জীবতাত্ত্বিক সাজসজ্জা (equipment)-ই হলো সংস্কৃতি বা সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশের প্রথম পূর্বশর্ত, তবে স্পষ্টতঃই এটিই সভ্যতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। জীবতাত্ত্বিক প্রয়োজন পরিপূরণের অপরিহার্য মনুষ্য চাহিদা থেকে প্রাথমিকভাবে উদ্ভূত ঐ সাজসজ্জা ব্যবহারের তাগিদটি সরাসরি মানুষের উদ্বর্তনের সাথে সম্পর্কিত ছিল, আর এসব জীবতাত্ত্বিক প্রয়োজনসমূহ পরিতুষ্ট হতে পারে কেবল যেহেতু মানুষ তার শক্তিসামর্থ্যকে প্রকৃতির বিনাশী শক্তি (forces) প্রতিহত করতে এবং প্রকৃতির দানকে

ব্যবহার করতে প্রয়োগ করে। অতএব, প্রাকৃতিক পরিবেশ হলো মানুষের জন্য সদা চ্যালেঞ্জস্বরূপ, আর সভ্যতা হলো উল্লেখযোগ্য মাত্রায় মানুষের সক্ষমতা ও তার চারপাশের প্রাকৃতিক জগতের মধ্যকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট প্রভাবাদির মাঝে আমরা ঐ প্রক্রিয়াটি উপলব্ধি করার গুরুত্বপূর্ণ চাবিটি খুঁজে পাই যদ্ধারা সভ্যতা বিকশিত হয়।[৫]

হেড্গার আরও বলেন, সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাববিস্তার-কারী উপাদানগুলো (factors) হলো নিম্নরূপ:

(১) বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও ব্যারোমেট্রিক চাপসহ জলবায়ু;
(২) মৃত্তিকা, খনিজ, পানি, প্রাকৃতিক গাছাপালা ও দেশজ প্রাণীসহ প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ (resources);
(৩) ভূমির রূপ (land forms); এবং
(৪) স্থানগত সম্বন্ধতা (space relationships) যার মধ্যে আপেক্ষিক ও স্থিরীকৃত অবস্থান (location), আয়তন (size) ও আকার (form) হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ দিক।[৬]

উপরিউক্ত পরিবেশগত উপাদানসমূহ সংস্কৃতির বিকাশকে প্রভাবিত করে প্রধানতঃ এই বাস্তবতার কারণে যে, অধিকাংশ মানবীয় প্রয়োজন ও চাহিদা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে কোন-না-কোন প্রকার অভিযোজনের মাধ্যমেই কেবল পরিতুষ্ট হতে পারে। তবে, সভ্যতা বিকাশের ফলে বা তার সাথে সাথে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের বিশেষ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। কৃষি, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত বিপ্লব সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে নানা গুণগত পর্যায় সূচিত করে। এর প্রতিটি পর্যায়ে বদলে ছিল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্কের চরিত্র; প্রকৃতি পুনর্গঠনে, অর্থনৈতিক আবর্তনীতে আরও বেশী করে পৃথিবীর খনিজ কাঁচামাল ও জৈবিক উৎসের মানবীয় ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। রুশ লেখক ইলিয়া নোভিক মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের ঐতিহাসিক ক্রমধারার মধ্যে তিনটি রূপকে বৈশিষ্ট্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ ও প্রকৃতির মিথষ্ক্রিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশের ক্ষেত্রে তিনটি রূপ বৈশিষ্ট্যসূচক [৭]:

(১) প্রকৃতির উপর মানুষের প্রগাঢ় নির্ভরতা। ধারণাগতভাবে এর প্রতিফলনের রূপ হিসেবে পৌরাণিক কাহিনী ও ধর্ম কাজ করে। মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য আবশ্যকীয় প্রাণরক্ষক উপকরণ প্রকৃতির কাছ থেকে জয় করে নেবার অসম্ভাব্যতার ভয়সহ নিয়ত বসবাস করেছে।
(২) মানুষ ও পরিবেশের দ্বিতীয় রুপটি অগ্রসরমান উৎপাদনের মধ্যে বাস্তবে অনুভূত হয় এবং বিজ্ঞানের মধ্যে ধারণাগতভাবে স্থিরীকৃত হয়। এটি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে যান্ত্রিক শিল্পের যুগে যা ২০০ বছর পূর্বে ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল। এটি

ক্রমবর্ধমান মাত্রায় প্রকৃতিকে আয়ত্বে আনার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। মানুষ/প্রকৃতি-র সম্বন্ধতা হয় বিজেতা ও বিজিতের সম্পর্ক। প্রকৃতির নতুন নতুন বিষয়গত প্রক্রিয়া মানুষের অধীন হয়। সকল পূর্ববর্তী সময়ের থেকে শক্তিশালী শিল্পের শক্তিসমূহ প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর ক্রিয়া করে। এই পর্যায়ে, প্রকৃতি প্রধানতঃ খাদ্য, বস্তু-উপাদান ও শক্তিসম্পদের দিক থেকেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

(৩) মানুষ ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার আধুনিক রূপ তথা তৃতীয় রূপটির স্বরূপ শিল্প/প্রকৃতি-র সম্বন্ধতার গতিশীল ভারসাম্যের ব্যাপক বিঘ্নতার মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়। জীবমন্ডলের নবায়নযোগ্য সম্পদাদির সমস্যা বিশেষভাবে জটিল হয়ে উঠেছে। শিল্প-বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনার প্রণালী অধিক থেকে অধিকতর জটিল হয়ে উঠেছে, এবং মানুষ ও তার উৎপাদন কর্মকান্ডের জন্য অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বায়ু ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা অধিক থেকে অধিকতর কঠিন হয়ে উঠছে।

## প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন : অনিবার্যতা ও অনিশ্চয়তা

বস্তুতঃ মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার সাম্প্রতিক পর্যায়টি নিঃসন্দেহে ইতিহাসের অন্যান্য পর্যায় থেকে গুণগতভাবে স্বতন্ত্র চরিত্র অর্জন করেছে। ইতিহাসের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোতে অনধিক জনসংখ্যা, বিপুল অকর্ষিত জমির উপস্থিতি, মুখ্যতঃ অকৃত্রিম যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর তেমন ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি হয়নি। অধিকন্তু, মানুষের কর্মকান্ডের ভারে কোন স্থানীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হলেও মানুষ সহজেই তার প্রাকৃতিক ঠিকানা বদল করতে সক্ষম ছিল। মৃত্তিকা ক্ষয়ের ফলে জমি পরিত্যক্ত বিবেচিত হলে মানবগোষ্ঠী অন্যত্র উপযোগী স্থানে আবাস গড়ে তুলতো, শুরু করতো নতুনভাবে জীবন। এককথায়, পূর্ববর্তী সমাজগুলোয় মানবজাতির জীবনের প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিধি ছিল ক্ষুদ্র, তাদের নেতিবাচক বা দূষণমূলক কর্মকান্ডের ফলাফল প্রকৃতির বিশাল আত্তীকরণ শক্তি স্বাভাবিকভাবে শোধন করে দিতো। গ্রিগোরি খোজিনের ভাষায়,

> জীবমণ্ডলের কর্ম-প্রক্রিয়ার আয়তনের সংগে তুলনা করলে সমস্ত আদি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন-ব্যবস্থায় মানবজাতির ক্রিয়াকলাপের আয়তন এতই নগণ্য ছিল যে, তা প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মনুষ্য ক্রিয়া-কলাপকে বস্তুতঃ উপেক্ষা করার সম্ভাবনা দিয়েছিল। এই বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের নেতিবাচক প্রভাবের মোট আয়তন থেকে জীবমন্ডলের ক্ষতিপূরণজনিত সম্ভাবনা ছিল কিছু পরিমাণ বেশী। তাই সমাজের ক্রিয়াকলাপের ফলে উদ্ভূত অধিকাংশ বর্জ্য পদার্থের আত্মীকরণ ঘটত স্বাভাবিক পথে, আর যেসব অঞ্চলের প্রকৃতির সবিশেষ ক্ষতি করা হয়েছিল, মানুষ সেসব জায়গা ছেড়ে অন্যত্র সম্পদ উদ্ধারের কাজ শুরু করেছিল।[৮]

কিন্তু বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি; সকল কর্ষণযোগ্য জমিতে চাষাবাদ; কৃত্রিম যন্ত্রপাতি ও শিল্প-পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন; শক্তি, খনিজ কাঁচামাল ও জৈবিক সম্পদের আত্যন্তিক পরিভোগ; নগরায়ন প্রভৃতি কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করেছে, প্রকৃতির আত্মীকরণ শক্তি ও তার ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে ক্ষুন্ন করতে শুরু করেছে।

লক্ষণীয়, মানুষ শারীরিক, জীবতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিকভাবে প্রকৃতির সাথে অভিযোজিত হয়।[৯] তবে, বর্তমানে প্রকৃতির সাথে মানুষের অভিযোজনের রূপ বা ধারা যত না জীবতাত্ত্বিক তার চেয়ে অনেক বেশী সাংস্কৃতিক।[১০] আর মানুষের এই সাংস্কৃতিক অভিযোজন তথা তার রচিত সভ্যতার ধরনই পরিবেশ দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ তার স্বার্থে বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশকে পরিবর্তিত করে ভিন্ন রূপ দান করেছে। এই রূপায়নের ক্ষেত্রে মানুষের অমোঘ চাহিদা, অজ্ঞতা, অপরিণামদর্শীতা ও স্বার্থবাদিতা সম্মিলিতভাবে ব্যাপক দূষণের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। পরিবেশকে পরিবর্তনের মাধ্যমে কিরূপে মানুষ সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে নির্মাণ করেছে এবং সাথে সাথে পরিবেশকে দূষিত করেছে নিম্নোক্ত কথাগুলো থেকে তা খানিকটা উপলব্ধি করা যেতে পারে:

> যে কোন প্রাণী তার পরিবেশের অন্যান্য প্রাণী ও বস্তুজগতের সংগে একটি মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্কে বেঁচে থাকে, একে বলে ইকো-ব্যবস্থা। এই ইকো-ব্যবস্থা যেমন স্থানিক,..., তেমনি সমস্ত ইকো-ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দরুন বিশ্বব্যাপী একটি সার্বিক ইকো-ব্যবস্থা রয়েছে বলে ধরা হয়। যে জন্য জীবমন্ডলকে ইকোমন্ডলও বলা চলে। মানুষের সভ্যতা এতে হস্তক্ষেপ করল। সে তার পরিবেশের অংগ না হয়ে পরিবেশকে সে বুঝতে শিখল, তারপর সে মানুষের নিজের প্রয়োজন মতো পরিবেশ গড়ল। বিভিন্ন প্রজাতির শস্যকে বাড়তে না দিয়ে কিছু বিশেষ প্রজাতির শস্য চাষ শুরু করল। প্রকৃতির বিভিন্ন রসদ, যা কোনোদিন জীবমন্ডলের রাসায়নিক আবর্তনে ছিল না যেমন মাটির তলা থেকে ধাতু, কয়লা, তেল বের করে তার বর্জ্যবস্তু পরিবেশে যোগ করল। এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ তৈরী করল যা প্রকৃতিতে অনুপস্থিত। তার প্রয়োজনমতো বন কেটে কৃষিজমি বানাল, শহর তৈরী করল, বাঁধলো নদী। এই সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই কিন্তু সভ্যতার বিকাশ। সভ্যতার বিকাশে প্রকৃতিকে নিজের মতো ব্যবহার করা ও পরিবর্তন করা ছাড়া কোনো পথ নেই।[১১]

সুতরাং মানুষের জীবতাত্ত্বিক বিবর্তন যেমন তেমনি তার সাংস্কৃতিক বিবর্তন অপরিহার্য রূপে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কোন-না-কোন ভাবে পরিবর্তিত করে। তাই, পরিবেশ দূষণ বা বিপর্যয়ের হাত থেকে প্রকৃতি বা পরিবেশ রক্ষার প্রত্যয়টিকে কোন

চূড়ান্ত অপরিবর্তনীয়তা বা মানবীয় হস্তক্ষেপ বহির্ভূত অর্থে বিবেচনা করা যায় না। বিবেচনা করলে তা হবে নিতান্তই কল্পমূলক (utopia)। তাছাড়া, প্রকৃতি বা পরিবেশ স্বয়ং কোন স্থির-স্থায়ী অবস্থা নয়, বরং তা সর্বদা একটা গতিশীল ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা। ফরাসী পরিবেশবিদ রেনে দুবো (Rene Dubos) যথার্থই বলেন, এমন কি কঠোরতম সংরক্ষণমূলক কর্মপন্থাও মানুষের আদিম পরিবেশকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে না, আর যদি এরূপ অবস্থান অর্জনযোগ্য হয়ও তাহলে তা হবে অনাকাঙ্খিত। তিনি আরও বলেন, বিকশিত প্রকৃতিকে অলঙ্ঘনীয়ভাবে সংরক্ষিত হওয়ার বস্তু (object) রূপে কিংবা শোষণাধীন বস্তুরূপে গণ্য করার দরকার নেই; বরং তা গণ্য হবে এক ধরনের উদ্যান রূপে যার সুপ্ত সম্ভাবনাসমূহের যথোচিত মূল্য হিসাবসহ পরিচর্যা করা হবে এবং যা তার ভিতর বসবাসকারী লোককে তাদের কর্মদক্ষতা (বা সক্ষমতা) অনুযায়ী বিকশিত হওয়াকে অনুমোদন করবে। অ-উৎপীড়নকর, গঠনমূলক অবস্থার মধ্যে সহাবস্থান করাই হবে মানুষ ও প্রকৃতির জন্য আদর্শ।[১২]

সংক্ষেপে বলা যায়, মানবেতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে তথা সকল পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোতে শক্তিশালী প্রকৃতির মুখোমুখি মানুষ ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অতীতে মানুষ পরক, ভয়ংকর ও অবোধ্য প্রকৃতির দ্বারা আতঙ্কিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে মানুষ আধুনিক শিল্প-কলকারখানার অসমন্বিত শক্তির ভয়ে ভীত। আজকের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিপ্লবের যুগে মানুষের প্রাযুক্তিক শক্তি- যা তার ফলাফলের ক্ষেত্রে অসমন্বিত- প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক কার্যধারা তথা ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সংস্কার-অসাধ্য বৈরী পরিবর্তন বা পতন ঘটাতে পারে। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পগত বিপ্লবের বৈশ্বিক বিকাশের মধ্য দিয়ে পরিবেশে নানা প্রতিকূল উপাদানসমূহ স্থান নিয়েছে। ভূ-মন্ডলীর ইতিহাসে প্রতিকূল পরিবেশগত পরিস্থিতি একাধিক বার দেখা দিলেও আজকের বাস্তবতা তাই খুবই ভিন্ন। খোজিনের ভাষায়,

> "প্রকৃতির সংগে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বর্তমান পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হলো মানবজাতির পুনর্গঠনজনিত কাজকর্মের আয়তনের বিপুল বৃদ্ধি, যে-কাজ একগুচ্ছ সূচক অনুসারে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলোর সংগে সমমাপের আকার লাভ করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশে গভীর হস্তক্ষেপের ফলে তাতে একমুখো নেতিবাচক রদবদল ঘটতে পারে।"[১৩]

বস্তুতঃ বর্তমানে মানুষের কর্মকান্ড যেমন তেমনি মানুষ নিজে যেন এক ভূতাত্ত্বিক শক্তি হয়ে উঠেছে। রুশ বিজ্ঞানী ভ. ই. ভেরনাদস্কি- যিনি মানবজাতির স্বার্থে জীবমন্ডলের এক সতর্ক ও ইতিবাচক পুনর্গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন- বলেন, প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় শক্তিশালী যুদ্ধকে ঐতিহাসিক ছাড়াও এক ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া রূপে গণ্য করা যায়। পরিণতির দিক দিয়ে বিশ্বযুদ্ধকে অতীতের বড় বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলোর সংগে তুলনা করা যায়। স্বীয় কর্মকান্ডের মাপানুসারে মানবজাতি শক্তিশালী ও ক্রমবর্ধমান ভূ-তাত্ত্বিক শক্তি হয়ে উঠছে।[১৪]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, মানুষের পরাক্রম আজ অতীতের তুলনায় যেমন বহুমুখী তেমনি বহু দূর প্রসারিত। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে তার জয়যাত্রা সোচ্চারিত। এমন কি অনেকের মনে, পরিবেশের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার দিনে, এমন স্বপ্নও দানা বেঁধে উঠেছে যে, 'the biosphere is deteriorating– there's nothing terrible in that– we'll pollute and fly away';[১৫] অর্থাৎ অন্য গ্রহে পালিয়ে বাঁচার স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে অবশ্য সচেতন মহল নাকচ করে দিচ্ছেন। পল. বি. সিয়ার্স বলেন, "সে (মানুষ) শূন্যে উড়তে ও পানিতে ডুব দিতে পারে। এমন কি, অন্যগ্রহে পৌঁছার স্বপ্নও দেখে থাকে। এতসব সত্ত্বেও সে পৃথিবীনির্ভর- যতই সে এইটি স্বীকার করতে অনিচ্ছুক হউক না কেন।"[১৬]

## বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতির গুরুত্ব (Importance of Humility and Precaution Principles)

নোভিক বর্তমান বাস্তুতান্ত্রিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করে তার তিনটি মৌলিক অবস্থা বা বাস্তবতাকে চিহ্নিত করেন। এগুলো হলো: (১) আমাদের গ্রহের ভৌত সম্পদসমূহ অসীম নয়; (২) মানবীয় ক্রিয়াকলাপের বর্তমান রূপের ফলাফলকে আত্মীকরণের জীবমন্ডলীয় সম্ভাবনা (বা সাধ্যতা) নিঃশেষিত অবস্থার কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে; (৩) মানবীয় ক্রিয়াকলাপের চরিত্র ও সংগঠনের ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন নির্ধারণ করা দরকার, যা জীবমন্ডলীয় বিপর্যয় প্রতিরোধ করার জন্য আবশ্যক।[১৭]

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বিকাশের জন্য প্রকৃতিতে মানুষের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য। অথচ, এই হস্তক্ষেপ থেকেই এক পর্যায়ে সম্মিলিত পরিণতি রূপে পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটছে এবং তারই ফলস্বরূপ মানবজাতির স্বয়ং অস্তিত্বই হুমকিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। আমরা জানি যে, মানব অস্তিত্ব হলো নৈতিকতার আবশ্যম্ভাবী ভিত্তি, আর তার উৎকর্ষই হলো নৈতিকতার লক্ষ্য। আর এ কারণেই মানব-অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও তার উৎকর্ষ নৈতিকভাবে কাম্য। সুতরাং অস্তিত্বের সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য আমাদেরকে প্রকৃতিতে বা পরিবেশে হস্তক্ষেপের বেলায় গভীর সতর্কতা, সংযম ও বিবেচনাবোধের পরিচয় দিতে হবে।

মার্কস্‌বাদের প্রতিষ্ঠাতাদ্বয় মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের সজ্ঞানতার গুরুত্বকে স্মরণ করিয়ে দেন। মার্কস্‌ বলেন, "চাষাবাদ যখন সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বদলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলে ... তা পিছনে মরুভূমি রেখে যায়।"[১৮] এঙ্গেলস বলেন,

> "প্রকৃতির উপর আমাদের জয়লাভ নিয়ে অবশ্য আত্মতোষামোদ নিরর্থক। এইসব বিজয়ের প্রত্যেকটির জন্যই প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি জয়লাভ থেকে প্রথমত আমাদের প্রত্যাশিত ফল লাভই ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে দেখা দেয় সম্পূর্ণ আলাদা, অভাবিত ফলাফল, যাতে প্রায়ই প্রথমটি বাতিল হয়ে যায়।"[১৯]

এঙ্গেলস মত প্রকাশ করে বলেন, আমরা যেন প্রকৃতির উপর বলদর্পী বিজয়ীর মতো আচরণ না করি, বরং তার নিয়মগুলোকে বুঝে নিয়ে তদনুসারে আমাদের কর্মধারা নির্ধারণ করি:

> "ভিনদেশী জনতার উপর একজন বিজয়ীর মতো, প্রকৃতির বহিঃস্থ কোন ব্যক্তির মতো আমরা যেন কোনভাবেই প্রকৃতির উপর শাসন না চালায়। আমরা রক্ত, মাংস ও মস্তিষ্কসহ প্রকৃতির সাথেই জড়িত এবং তারই মাঝখানে অস্তিমান। প্রকৃতির উপর আমাদের সকল প্রভুত্ব এই বাস্তবতার উপরই প্রোথিত যে, অন্যান্য সকল সৃষ্ট জীবের তুলনায় কেবল আমাদেরই রয়েছে প্রকৃতির নিয়মগুলো শিখে নেবার এবং তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার এক অনবদ্য সামর্থ্য।"[২০]

আমরা কেউই নৈতিক কারণে আমাদের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতাকে ব্যাহত বা স্তব্ধ করতে পারি না। অপরের অস্তিত্বের বিঘ্নতা বা বিনাশও আমরা নৈতিকভাবে কামনা করতে পারি না। ইমানুয়েল কান্ট বলেন, মানুষ স্বীয় মূল্যে মূল্যবান। এজন্য মানুষের ক্ষতি হয় এমন কাজ নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই স্ব-মূল্যে মূল্যবান সকল মানুষের অভীষ্টকে নিজের অভীষ্ট বলেও গণ্য করা উচিত।[২১] অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব যেমন তেমনি অপরের অস্তিত্বকে আমরা দুর্দশা বা বিনাশের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি না। বরং তার উন্নয়ন বা উৎকর্ষই আমাদের নৈতিক লক্ষ্য।

ফরাসী ভাষার জনৈক কবি বলেছিলেন, পৃথিবী (তথা প্রকৃতি) এমন একটি গ্রন্থ যার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা হারিয়ে গেছে। বর্তমানে সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগেও প্রকৃতি বা পরিবেশের সামগ্রিক স্বরূপ সম্বন্ধে মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রকৃতির উৎপত্তি কবে, কিভাবে এবং এর চূড়ান্ত পরিণতি কি -এ ধরনের খুবই মৌলিক বা দার্শনিক জিজ্ঞাসার কথা বাদ দিলেও প্রকৃতির গোটা কার্যধারার গতি-প্রকৃতি কি, প্রকৃতির অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর প্রকৃত গঠন ও তার অন্তর্নিহিত শক্তি-সম্ভাবনার মাত্রা ও বৈশিষ্ট্য কি, বিভিন্ন বস্তুর আন্তঃসম্পর্কের ধরন ও সীমা কি -এ সম্পর্কে আমাদের বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ। আমরা জানি যে, স্বতন্ত্র বায়ু বিদূষকগুলোর পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়ার তুলনায় তাদের আন্তঃক্রিয়া (Interaction)-জনিত দূষণ অধিকতর মারাত্মক। অথচ, এই আন্তঃক্রিয়ার সকল প্রকার বা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমাদের বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

খাদ্য ও খাদকের নানা সম্পর্কে, নানা সহযোগিতায় জীবজগতের প্রতি স্তরে ও সকল জীবের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রয়েছে। অনেক সময় আমরা নিজেদের স্বার্থে, উন্নতি বা উন্নয়নের স্বার্থে এই ভারসাম্যপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন ঘটাই এবং ফলস্বরূপ বিপরীত তথা অযাচিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। প্রসঙ্গতঃ পল. বি. সিয়ার্স কর্তৃক বিবৃত ভোঁদর, কচ্ছপ ও পাতিহাঁস চক্রটির কথা উল্লেখ করা যায়:

> একটি সুপরিচিত নজির হল ভোঁদরদের মেরে ফেলে বুনো পাতিহাঁসের জন্যে আবাসস্থল 'উন্নতি' করার প্রচেষ্টা। অচিরেই পাতিহাঁসগুলোও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কেননা, সন্তরণরত পাতিহাঁসগুলো কচ্ছপদের চমৎকার শিকারে পরিণত হতে লাগল। আর, যে ভোঁদর কচ্ছপদের ডিম খেতে পছন্দ করত, তাদের অবসানে কচ্ছপদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়েছিল।[২২]

বস্তুতঃ আমাদের বিভিন্ন প্রকার কর্মকান্ড কতদূর অগ্রসর হলে প্রকৃতি বা পরিবেশের ভারসাম্যকে বিপর্যস্ত করে, এবং পরিবেশের ভারসাম্যের লঙ্ঘন থেকে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে কিংবা তার প্রভাব কত বিভিন্নমুখী হতে পারে- এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক সময় ঘটনা ঘটার পূর্বে 'পরিপক্ক' হয়ে উঠতে পারে না। এজন্য অনেক সময় 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'-র মতো অনেক কিছুর জ্ঞান অনেক কিছু হারিয়ে মানবজাতিকে অর্জন করতে হয়। এই বাস্তবতা থেকে এই তাগিদ অনুভূত হয় যে, মানবজাতিকে মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক ও সংযমী হওয়া উচিৎ; দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের প্রতি তার একটি বিনয়ী দৃষ্টিভঙ্গি বা সমীহ বোধ থাকা উচিৎ-এই অর্থে যে, তার কর্মকান্ডকে তার জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকৃতি যে-কোন মূহুর্তে নাকচ করে দিতে পারে।

মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিনয়ী ও সংযত পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদের আর একটি উৎস হলো স্বয়ং মানুষের প্রকৃতি। আমাদের নিজ স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান তথা মানবজাতির প্রকৃতি সম্বন্ধে মানবজাতির জ্ঞান পুরোপুরি আস্থাযোগ্য নয়। মরিসনের লেখা 'বিজ্ঞান, ঔষধ এবং মানুষ' নামক প্রবন্ধের ভূমিকা লিখতে গিয়ে এল ব্রাইসন বলেন,

> "মানুষ এক দুর্জ্ঞেয় জটিলতা। শত শত বৎসরের প্রচেষ্টায় আমরা তার সম্বন্ধে যা জেনেছি তাতে এই দুর্জ্ঞেয়তা আদৌ সহজ হয়নি। ... একালে আমরা বিশ্বাস করি, জীবন বহু পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরী একটি ক্রম; সুতরাং মানুষ একই সংগে বহু কিছু; একাধারে সে পশু, যন্ত্র, রাসায়নিক কারখানা, বার্তা প্রেরক, সমাজের অংশ, ঘটনা সংগ্রাহক, চিত্রকর, নতুনের প্রবর্তক বা আবিষ্কারক, অনুকারক, রাজনৈতিক জীব, ভবিষ্যতের জন্মদাতা, স্বকীয় এবং সমগ্র মানব সমাজের অতীতের বরপুত্র। কিন্তু আলাদা অথচ পারস্পরিক বন্ধনসূত্রে সক্রিয় কোন সত্তা, মানব চরিত্রের কতটুকু নিয়ামক, এই প্রশ্নের উত্তর এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন নি।"[২৩]

মানব প্রকৃতিতে যেমন নানা দুর্বলতা নিহিত রয়েছে তেমনি রয়েছে জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা। এ সম্বন্ধে পোটারের কথাটি স্মরণ করা যায় :

> আমাদের সকলেরই রয়েছে আত্ম-সত্তা ও অহম সংরক্ষণের প্রবৃত্তি, এবং আমাদের রয়েছে আবেগ, ভাবাবেগ ও অযৌক্তিক মূহুর্তসমূহ। অধিকন্তু,

> আমরা এমনভাবে গঠিত যে, প্রতিটি নতুন ধারণা কতিপয় সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত আবির্ভূত হয় এবং আমাদের মধ্যে ভিত্তিহীন আশাবাদ ও আত্মশক্তির ভাবাবেগ সৃষ্টি করে।[২৪]

প্রকৃতির প্রকৃতি ও মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানবজাতির জ্ঞান পুরোপুরি আস্থাযোগ্য না হলেও তার জ্ঞানের বিস্তার ও ক্ষমতার প্রসার যে বহুদূর-বহুদিক স্পর্শ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনেকে তাই বলেন, মানবজাতি পূর্বে কখনও এমন গর্বসহকারে নিজ পরাক্রমের অনুভূতি অর্জন করেনি। পৃথিবীর উপরিতল জুড়ে মানুষের অবাধ যাতায়ত, সাগর-মহাসাগরগুলো তার আয়ত্তাধীন, বস্তুকে বিশ্লেষণ করে তার গভীর রহস্যে সে মনোনিবেশ করেছে, মহাশূন্যে ভেসে আপন পৃথিবীকেও অবলোকন করেছে। তথাপি, তার অর্জিত জ্ঞান ও তার প্রয়োগ এক অসমন্বিত ও নেতিবাচক ফলাফল সৃষ্টি করে চলেছে। মানুষের সাম্প্রতিক জ্ঞানের চরিত্রকে প্রকাশ করতে গিয়ে 'বিপজ্জনক জ্ঞান' ('dangerous knowledge') নামক একটি প্রত্যয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে: বিপজ্জনক জ্ঞান হলো এমন জ্ঞান যা প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার তুলনায় দ্রুততর গতিতে সঞ্চিত হয়।[২৫]
এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, প্রকৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়ায় সংযুক্ত হতে হয়। প্রসঙ্গতঃ হোয়াইটহেডের কথাটি স্মরণ করা যায় :

> কখনো কোন জিনিস আস্ত গিলে খেয়ো না। আমরা অর্ধ-সত্য নিয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হই আর সেগুলিকে যতদিন গোটা সত্য বলে ভুল না করি ততদিন বেশ ভালোই থাকি। কিন্তু যে মূহুর্তে তাদের অখন্ড সত্য বলে ভুল করি তখনই তারা আমাদের মধ্যে শয়তানকে জাগিয়ে তোলে।[২৬]

বস্তুতঃ আজকের এই পরিস্থিতিতে হোয়াইটহেডের কথার তাৎপর্য সমধিক। প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সুবিবেচনাপূর্ণ, সংযত ও বিনয়ী দৃষ্টিভঙ্গি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে যে দুরবস্থা বা দুর্দশা সৃষ্টি হয় বা হতে পারে তা যেমন আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কামনা করি না, তেমনি অপরকে এই দুরবস্থায় নিপতিত করার কোন অধিকারও আমাদের নেই। এখানে এই সাধারণ নৈতিক বিবেচনা বোধটি সক্রিয় যে, যা আমরা আমাদের নিজেদের জন্য কামনা করি না তা আমরা অপরের জন্য কামনা করতে পারি না। এক কথায়, নৈতিক কারণে আমরা সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য। ফ্রাঙ্কিনা বলেন, "আমাদের আচরণ ও মনোভাবের জন্য সমগ্র মানব সম্প্রদায় ও চেতনা সম্পন্ন সত্তাদের উপর কি সম্ভাব্য ফলাফল দেখা দিতে পারে, তার সচেতনতাই নৈতিকতার মূল কথা।"[২৭]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তথা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিনম্রতা ও সতর্কতার নীতি ধর্মীয় জীবন দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্ব পায়। জীবনের

সকল ক্ষেত্রে 'সীমা' রক্ষা করার জন্য ইসলাম জোর তাগিদ দেয়। বিনম্রতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

> "'রাহমান'-এর বান্দা তাহারাই, যাহারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাহাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তাহারা বলে, 'সালাম';...।"(২৫: ৬৩)[২৮] ("And the servants of (God) Most Gracious are those who walk on the earth in humility, and when the ignorant address them, they say, 'peace!'; ") (25: 63)

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে:

> "অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং...।"(৩১: ১৮-১৯)[২৯] ("And swell not thy cheek (For pride) at men, nor walk in insolence through the earth; For God loveth not any arrogant boaster. And be moderate in thy pace,.... ") (৩১: ১৮-১৯)

এবং সতর্কতা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে:

> "হে মু'মিনগণ! সতর্কতা অবলম্বন কর;...।"(৪: ৭১)[৩১] ("O ye who believe! Take your precautions,.... ") (4: 71)

ওল্ড টেস্টামেন্টে বিবৃত হয়েছে:

> "বস্তুতঃ ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবে তোমার ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন, ইহা ব্যতিরেকে সদাপ্রভু তোমার কাছে আর কিসের অনুসন্ধান করেন?" (মীখা ৬: ৮)[৩২] ("What doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?") (Michah 6:8)।

অন্যদিকে নিউ টেস্টামেন্টে বিবৃত হয়েছে:

> "অতএব যে কেহ আপনাকে এই শিশুর মত নত করে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ।" (মথি ১৮: ৪)[৩৩] ("Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven.") (Matthew 18: 4);

নিউ টেস্টামেন্টে আরও বিবৃত হয়েছে:

> "কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে, আর যে কেহ আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।" (লূক ১৪: ১১)[৩৪] ("For whosoever exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.") (Luke 14: 11)।

সুতরাং ধর্মীয় জীবন দর্শনে বিনম্রতা ও সতর্কতার নীতিকে ধর্মীয় ও জ্ঞানময় জীবনের বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অহংকার, ঔদ্ধত্যের পরিবর্তে 'বিনম্রতা' ও 'সতর্কতা' নীতি মান্য করে জীবন চলার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ন্যায্য আচরণ, দয়ায় অনুরাগ ও নম্রভাবকে একই সাথে সদগুণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

## উপসংহার

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, 'বিনম্রতা' ও 'সতর্কতা' নিজস্ব গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কারণে ধর্মীয় ও ধর্ম-নিরপেক্ষ উভয় প্রকার জীবন-দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ সদগুণ ও নীতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রকৃতি, সুক্ষ্মতা ও ভারসাম্য সম্বন্ধে মানবীয় জ্ঞানের রয়েছে স্বল্পতা-সীমাবদ্ধতা। বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিণাম, বিভিন্ন প্রাকৃতিক চক্র, যথা: খাদ্য চক্র, বারি চক্র -এ হস্তক্ষেপজনিত পরিণতি আমাদের অজ্ঞাত, কখনও কখনও এতদ্‌সংক্রান্ত জ্ঞান অপূর্ণ বা ভাসাভাসা। প্রকৃতির গঠন ও কার্যধারা এবং সেসবে হস্তক্ষেপজনিত ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের এই অজ্ঞতা ও অপূর্ণ জ্ঞানের কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধনে বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। মানবপ্রকৃতির নানা রূপ দুর্বলতা-জটিলতা, যথা: আবেগ-উচ্ছ্বাস, পক্ষপাত, অপর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির কারণে যথাযথ বিবেচনা করা ও কর্ম-কৌশল গ্রহণ করা অনেক সময় সম্ভব হয় না; এজন্যেও প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধনে বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতি মান্য করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বা বিবেচ্য কার্য ও কারণের সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকভাবে সুনিশ্চিত না হলেও পরিবেশগত ঝুঁকির পরিণাম বিবেচনা করে, অভাবিত দুর্গতির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি ভেবে অর্থাৎ মানবজাতির অস্তিত্ব, জীবন ও কল্যাণ বিবেচনা করে আমাদের উচিৎ বিনম্রতা ও সতর্কতা নীতি মান্য করে পথ চলা, প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন সাধনে অগ্রসর হওয়া।

## তথ্য নির্দেশ


১. Humility. (2015, January 18). In *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Retrieved March 16, 2015, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Humility&oldid=643070829

২. UNESCO COMEST report The Precautionary Principle, Paris: France, 2005, p. 7.

৩. Rio Declaration on Environment and Development, Principle 15, June 14, 1992, U.N. Doc. A/Conf. 151/5/Rev. 1 (1992), reprinted in 31 I.L.M. 876 (1992).

৪. Hepburn, Ronald W., "Philosophical Ideas of Nature", In Edward Paul ed. *The Encyclopedia of Philosophy*, New York: Macmillan and the Free Press, 1972, Vol. 5, p. 154.

৫. Hedger, G. A., *An Introduction to Western Civilization,* New York: The Odyssey Press, 1949, p. 71; here is quoted from *Our Physical Environment: A Problem Approach* written by Leonard W. Gaddum and Harold L. Knowles, Boston: Houghton Mifflin Company, 1953, pp. 1-2.

৬. Ibid, p. 72; here is quoted from *Our Physical Environment: A Problem Approach,* p. 2.

৭. Novik, Ilya, *Society and Nature,* Moscow: Progress Publishers, 1981, pp. 32-33.

৮. খোজিন, গ্রিগোরি, *ভবিষ্যৎ বিতর্ক: বিপর্যয়হীন বিকাশ*, অনু: সুবীর মজুমদার, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৯, পৃ. ৮৪।

৯. Potter, Van Rensselaer, *Bioethics: Bridge to the Future,* Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1971, pp. 22-24.

১০. Greenwood, N. J. and Edwards, J. M. B., *Human Environments and Natural Systems,* 2nd edition, North Scituate, Massachusetts: Duxbury Press, 1979, pp. 35-36.

১১. রায়, মোহিত, "দূষণ ও দর্শন- একটি পরিক্রমা", মোহিত রায় সম্পাদিত *প্রসঙ্গ: পরিবেশ (দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান)*, কলকাতা: অনুষ্টুপ, ১৯৯১, পৃ. ১৮১।

১২. Dubos, Rene, "Man and His Ecosystem: The Establishment of a Dynamic Equilibrium with the Environment", In V. A. Kovda ed. *Biosfera i eyo resursy,* Moscow: Nauka, 1971, pp. 72-89; here is cited from *Society and Nature* written by Ilya Novik, Moscow: Progress Publishers, 1981, p. 20, 23.

১৩. খোজিন, গ্রিগোরি, *ভবিষ্যৎ বিতর্ক: বিপর্যয়হীন বিকাশ*, পৃ. ৮৫।

১৪. এখানে গ্রিগোরি খোজিন লিখিত *ভবিষ্যৎ বিতর্ক: বিপর্যয়হীন বিকাশ*, পৃ. ১১ হতে উল্লেখিত।

১৫. Novik, Ilya, *Society and Nature,* p. 60.

১৬. সিয়ার্স, পল. বি., "মানব ও প্রকৃতির ভারসাম্য", লিম্যান ব্রাইসন সম্পা: *আধুনিক জগৎ ও মানবজ্ঞান*, অনু: আখতারুজ্জামান ও অন্যান্য, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ২৯৮।

১৭. Novik, Ilya, *Society and Nature,* p. 12.

১৮. Marx, Karl and Engels, Frederick, *Selected Correspondence*, Moscow: Progress Publishers, 1975, p. 190; এখানে ইয়ে. প্লিমাক ও আ. ভলোদিন লিখিত *সমাজ বিকাশের ধারা*, অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৫, পৃ. ১৭৪ হতে উদ্ধৃত।

১৯. Engels, Frederick, *Dialectics of Nature,* Moscow: Progress Publishers, 1974, p. 180; এখানে ইয়ে. প্লিমাক ও আ. ভলোদিন লিখিত *সমাজ বিকাশের ধারা*, পৃ. ১৬৮ হতে উদ্ধৃত।

২০. Ibid, p. 180, here is quoted from *Society and the Environment,* Moscow: Progress Publishers, 1983, p. 116.

২১. ওয়াহাব, শেখ আবদুল, *কান্টের নীতিদর্শন*, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৮২, পৃ. ২৫৪-২৫৬।

২২. সিয়ার্স, পল. বি., "মানব ও প্রকৃতির ভারসাম্য", পৃ. ২৯৬-২৯৭।

২৩. ব্রাইসন, লিম্যান, সম্পা: *আধুনিক জগৎ ও মানবজ্ঞান*, অনু: আখতারুজ্জামান ও অন্যান্য, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ৩-৪।
২৪. Potter, Van Rensselaer, *Bioethics: Bridge to the Future*, p. 5.
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।
২৬. এখানে লিম্যান ব্রাইসন সম্পা: *আধুনিক জগৎ ও মানবজ্ঞান*, পৃ. ৫১ হতে উদ্ধৃত।
২৭. ওয়াহাব, শেখ আবদুল, *বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯৩।
২৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, *আল-কুরআনুল করীম*, ২০০৫, পৃ. ৫৮৪।
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৬-৬৬৭।
৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২।
৩১. ভারতের বাইবেল সোসাইটি, বাঙ্গালোর, *পবিত্র বাইবেল: পুরাতন ও নূতন নিয়ম*, ২০০৩, পৃ. ১১০৩।
৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১ (নূতন নিয়ম)। প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১ (নূতন নিয়ম)।